বালিসোনার মহাকাব্য

ওমর কায়সার

বালিসোনা একটি গ্রামের নাম। সেই গ্রামের পশ্চিমে জলের অতীত নিয়ে শুয়ে আছে সুদীর্ঘ এক নদী। এক শতাব্দী আগে সে নদী জীবন্ত ছিল। কেউ কেউ তাকে আদিগঙ্গা বলে ডাকে। এখন সে অতীত। হয়তো কোনওদিন আবার কবর থেকে উঠে এসে স্রোত ফিরে পাবে। তাকে তখন কেউ ডাকবে পাতালগঙ্গা নামে, আবার কেউ কেউ মিতাম্বর বা শাখানদীও ডাকতে পারে। সেই ঘুমিয়ে পড়া নদীটির পূর্বদিকে বালিসোনা গ্রামের বর্তমান বয়ে যাচ্ছে জীবনের মহাসমুদ্রের দিকে। ওখানে জীবনের কোলাহল। কত শত বছর ধরে এখানে মানুষ আসে, কিছুদিন কাটিয়ে চলে যায় অনন্তকালের দিকে। বালিসোনা যেন আমাদের এই সবুজ পৃথিবীর একটা প্রতীক। এখানে মানুষের জন্ম হয়, তারপর নানা বাঁক পেরিয়ে, সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার নানা ঘটনা ঘটিয়ে, দুর্ঘটনার শিকার হয়ে, দৈবদুর্বিপাকে পড়ে, অপঘাতে, দারিদ্রে, ঐশ্বর্যে, সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে একটি জীবন কাটিয়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে যায়। আবার নতুন মানুষ আসে। বালিসোনার শত শত বছরের জীবনের প্রাণবন্ত উপাখ্যানের নাম ‘বিষাদগাথা’। এই উপাখ্যানের রচয়িতা অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই নামটির সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছি। তাঁর লেখা ছোটদের বই ‘পাখির খাতা’ আমাকে দেখিয়ে মোমেন ভাই (কবি, প্রাবন্ধিক আবুল মোমেন) বলেছিলেন, ‘শিশুসাহিত্য এরকমই হওয়া উচিত। এটা পড়ে দেখ। আর এই বইতে চট্টগ্রামের ভাষার উল্লেখ আছে।’ প্রথমে বইটির প্রচ্ছদ দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। পড়ার পর মনে হল আরেকবার পড়ি। দ্বিতীয়বার পড়া শেষ করে মনে হল আবার পড়ি। প্রিয় কোনও গান যেমন বার বার শুনতে ইচ্ছে করে, তেমনি প্রিয় বইগুলোও বার বার পড়তে ইচ্ছে করে। এমন মন মজিয়ে রাখার মতো শিশুসাহিত্যের উদাহরণ দেখে আমি লেখকের ভক্ত হয়ে গেলাম। সেই থেকে সংগ্রহ করে পড়েছি তাঁর ‘হীরু ডাকাত’, ‘শাদা ঘোড়া’, ‘গৌর যাযাবর’, ‘তালগাছের ডোঙা’, ‘হরিণের সঙ্গে খেলা’, ‘আমার বনবাস’ সহ আরও কত কী। এর ক’দিন পর জানলাম আমার প্রিয় শিশুসাহিত্যিক দারুণ দারুণ সব ভ্রমণ কাহিনিও লেখেন। সময় গড়িয়ে যায়, আর আমি নতুন নতুন অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে আবিষ্কার করি। তিনি কখনও শিশুসাহিত্যিক, কখনও পর্যটক, কখনও ভ্রমণ কাহিনি রচয়িতা, কখনও ছোটগল্পকার, কখনও চিত্রশিল্পী। সব্যসাচী কথাটি

আক্ষরিক অর্থেই তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করা একেবারে যথার্থ হবে। আমি জানতাম না একজন পাঠক হিসেবে আমার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে। সেই বিস্ময়ের নাম 'বিষাদগাথা'। বালিসোনা নামে একটি গ্রামকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের বিস্তার। যতদিন আমি বালিসোনা-ভ্রমণে ছিলাম, ততদিন পার্থিব পৃথিবীর অন্য সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। বুঁদ হয়ে আটকে ছিলাম মন্থরোর মায়ের মায়ার জালে। হারিয়ে গিয়েছিলাম সামন্তপ্রভু ভুবনমোহনের শেষ জীবনের সঙ্গে। তিনমাসের জন্য ত্যাজ্যপুত্র হওয়ার বেদনা প্রৌঢ় হয়েও ভুলতে না পারা অবনীমোহনের সংসার ত্যাগে যেমন বিষণ্ণ হয়েছিলাম, তেমনি লক্ষ্মীপ্রতিমার জন্ম, কলকাতায় গিয়ে পড়ালেখা, অতঃপর ভারতসুন্দরী হয়ে তারকাখ্যাতি লাভ করে বালিসোনার প্রেমে ফিরে আসার পর বিস্মিত হয়েছিলাম, সরস্বতীর জন্ম, তার বেড়ে ওঠা, ধর্ষণের শিকার হওয়া, গয়ানাথ নামে এক মেথরের কাছে অপমানিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর অম্বরীশ এসে সরস্বতীর ওপর নৃশংস আচরণের প্রতিশোধ নিয়ে আবার চলে যাওয়ার মতো অসংখ্য ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়েছিলাম। বালিসোনা যেন অতিকায় সজীব সচল এক মহাকালের মঞ্চ। ওখানে অবিরাম মঞ্চস্থ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক নাটক। বহু মানুষ, বহু জীবন, বহু কালের ঘটনা নানা সূত্রে এসে বালিসোনায় মিলেছে। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে যেমন ক্ষীণ, খর, প্রশস্ত বহু জলধারা সাগরে এসে মেলে, তেমনি বহু জীবনের ধারা এই বালিসোনায় এসে মিশে গেছে। এত মানুষ, এত কাহিনি, এত ব্যাপ্ত প্রত্যেকের জীবন, ঠিক শুরু থেকে বুঝে উঠতে পারছিলাম না কাকে ঘিরে মূল কাহিনিটা এগিয়ে যাবে। না, প্রধান চরিত্র বলতে এখানে কাউকে তেমন খুঁজে পেলাম না। উপন্যাসের প্রথম সিকি অংশেই দেখলাম মন্থরোর মা, অবনীমোহন, ভুবনমোহন, অম্বরীশ, সরোজিনীর জীবনের উত্থান এবং পরিণতি। যার প্রসঙ্গ আসে তাকেই মনে হয়েছে বোধয় এটাই প্রধান চরিত্র। এটা ঠিক, প্রতিটি মানুষই তো যার যার জীবন কাহিনিতে মুখ্য চরিত্র। পৃথিবীতে যত কোটি মানুষ আছে, তত কোটি জীবনের কাহিনি আছে। বালিসোনার প্রতিটি মানুষের বেলায়ও তো একই ব্যাপার। প্রত্যেক মানুষের জীবন তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। জমিদারের যেমন জীবন আছে, জমাদারেরও জীবন আছে, ভিক্ষাবৃত্তি করে যে জীবন চালায় তারও জীবনের কাহিনি আছে। তাই প্রতিটি চরিত্রই মুখ্য হয়ে আলো ছড়ায় বিষাদগাথার পাতায় পাতায়। নানা মানুষের জীবনের আদ্যোপান্ত কাহিনির মহামিলনে, মহাজীবনের প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পেয়েছি এই সাহিত্যকীর্তিতে মহাকাব্যের আমেজে। পড়তে পড়তে তাই মনে হয়েছে বিষাদগাথার প্রায় প্রতিটি চরিত্র নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান তৈরি হতে পারত। হতে পারত আলাদা আলাদা গল্প কিংবা উপন্যাস। প্রত্যেকটা চরিত্রের বেড়ে ওঠা, উত্থান আর পরিণতি দেখে সেরকমই মনে হল। মন্থরোর মায়ের কথাই ধরি। এই মানুষটার পুরো একটা জীবন এখানে বর্ণিত আছে। একেবারে জন্ম থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। শুধু তার বৃত্তান্ত নয়, তার পূর্বপুরুষ বালিসোনায় এসে কীভাবে বংশপত্তন করেছিল তাও পাওয়া যায়। একটি মানুষের জীবনের ভিতর দিয়ে উপন্যাসে উঠে আসে একটা পুরো লোকালয়ের উত্থানের কাহিনি— 'মন্থরোর মা'র নানা ভাতের সন্ধানে মুর্শিদাবাদের

লালবাগে গরুর মেটের মতো পাতলা ইটের জরাজীর্ণ আব্বা-নানার ভিটে আর তাদের পরিবারের নিজস্ব কবরস্থানের মায়া ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে বালিসোনার এই পশ্চিম সীমানায় এসে যখন ডেরা বাঁধে তখন এখানকার এইসব গ্রাম বলতে ছিল শুধু বনজঙ্গল। সেই জঙ্গলে মন্থরোর মায়ের পূর্বপুরুষেরা লালবাগ নামে একটি এলাকার পত্তন করে। উপন্যাসের ৪৬টি পর্বের মধ্যে প্রথম ছয়টি পর্বেই মন্থরোর মায়ের পুর্বপুরুষের আবির্ভাব, তার জন্ম, বিয়ে, জীবিকা এবং জীবনের অবসান ঘটে। কিন্তু পুরো উপন্যাস জুড়ে তার রেশ থেকে যায়। অবাক লাগে হতদরিদ্র এই নারী যে প্রাণ হারিয়েছে সাপের ছোবলে, যার দুটো সন্তানও মারা গেছে সাপের কামড়ে, যার জীবন দারিদ্রে জর্জরিত, জীবনের শেষদিকে যে বাধ্য হয়েছে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিতে, সেও চরিত্রে আশ্চর্য মহিমাময়ী। কাউকে ঠকানো যার স্বভাবে নেই, বরং নিজেই ঠকবার জন্য স্বভাবটিকে বাগিয়ে রেখেছে। উপোস করে কিন্তু কখনও মুখ ফুটে দুটো পয়সা চাইত না। মন্থরোর মা সারাজীবন একটা কাজ করে গেছে, যেভাবে হোক সংসারের দুটো ভাত জোগাড় করা। সেই মন্থরোর মা মারা যাওয়ার বহু বছর পর তার ছেলে মন্থরো আশি বছর বয়সেও কপাল চাপড়ে কাঁদে আর বলে, আম্মা ভেন্ন কে আমার ক্ষুদার অন্ন জোগাবে। সেই কান্না যেন অন্নপূর্ণার জন্য এই পৃথিবীর কান্না, বালিসোনার কান্না। মন্থরোর মায়ের জীবন অবসানের মধ্য দিয়ে একটা উপকাহিনির শেষ নয়, বরং উপন্যাসের ভেতর আরেকটি উপন্যাসের যেন সমাপ্তি ঘটল। বিষাদগাথার প্রতিটি পর্ব অবিচ্ছিন্ন থেকেও প্রতিটির আলাদা আলাদা জৌলুস আছে। সেটা জীবনের জৌলুস। তাতে মানুষের মাহাত্ম্য যেমন আছে, তেমনি আছে বিষাদ।

উপন্যাসের শুরুতে মনে হয়েছিল আখ্যানের কেন্দ্র বুঝি লক্ষ্মীপ্রতিমা। জমিদারের বংশধর হয়েও যাকে জন্ম নিতে হযেছিল গ্রামের সাধারণ একটি হাসপাতালে। কিন্তু উপন্যাসের গতি সে দিকে যায়নি। নানা শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে সেটি সুবিশাল অশ্বত্থের মতো বিস্তৃত জায়গায় ছায়া ফেলেছে। জন্মের পর লক্ষ্মীপ্রতিমার মিস ইন্ডিয়া হতে লেগেছে মাত্র কয়েকশো শব্দ। সংক্ষিপ্ত বিবরণে তাকে জন্ম থেকে যৌবন পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ঘটনা মোড় নিল অন্যদিকে। লেখক শুরু করেছেন অন্যগল্প। বালিসোনার অন্য মানুষ উঠে এল সেই গল্পে। কারণ লক্ষ্মীপ্রতিমা তখন বালিসোনায় ছিলেন না। সব ঘটনার স্থান কিন্তু বালিসোনাই। পরে অবশ্য ভারতবিখ্যাত লক্ষ্মীপ্রতিমা যখন বালিসোনায় ফিরে আসেন তখন তার কাহিনি আবার শুরু হয়। আসার পরই তার বাবা সন্ন্যাসধর্ম নিয়ে কোথাও নিরুদ্দেশ হন। যে অনুন্নত হাসপাতালে তার জন্ম হয়েছিল, তার মানোন্নয়নের উদ্যোগ নেন তিনি। হাসপাতাল গড়ে তোলা সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে সেখানে সংসার শুরু করেন এক ভিনদেশিকে নিয়ে। সেখানে তার সংসার হয়, ভবিষ্যতে তার মেয়ে চিরন্তনী সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে যুক্ত হয়।

আগেও বলেছি বিষাদগাথার প্রতিটি চরিত্রই আলাদা আলাদা বৈশিষ্টে স্বতন্ত্র। পড়তে পড়তে প্রতিটি চরিত্রের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি হয়। পাঠকের আগ্রহ জন্মায় তার পরিণতি কোন দিকে গেছে তা জানার। পাঠক গভীর আগ্রহে নিমগ্ন হয় কোনও এক চরিত্রের ভেতর। ঠিক তখনই উড়ে আসে অন্য কাহিনির মানুষ। পাঠক নতুন মানুষের সান্নিধ্যে আসে। এইভাবে একের পর এক চরিত্রের উত্থান-পতনের স্রোতের ভেতর

পাঠক ভাসতে ভাসতে জীবনের মহাসমুদ্রে হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় তবে তলিয়ে যায় না, মজে যায়। কারণ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এই উপন্যাসের জন্য এমন একটা ভাষা তৈরি করেছেন, যে ভাষা আমাদের টানে কাহিনির পরিণতির দিকে। একরৈখিক নয়, বরং বহু বিচিত্র পথে এগিয়ে যায় গল্পগুলো। ভাষা যা কখনও কবিতার মতো, কখনও আবার সংবাদভাষ্যের মতো, কখনও ছোট ছোট বাক্যে চিত্ররূপময়, কখনও সুদীর্ঘ বাক্যের মায়াজালে বাঁধা। কখনও কখনও চলচ্চিত্রের মতো চারপাশের নিখুঁত, অনুপুঙ্খ ছবি তুলে ধরা হয়েছে। চারপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশ, চরিত্রের চিত্রণ, আমেজ ফুটিয়ে তুলতে তিনি ভাষাকে নিজের মতো ব্যবহার করেছেন। বিষাদগাথার কিছু কিছু বাক্য যদি আলাদাভাবে কাউকে শোনাই তবে মনে হবে কোনও কবিতার অংশ। সেরকম কবিতার গন্ধমাখা দু-একটা চরণ তুলে ধরছি পাঠক সমীপে।

'মাইলের পর মাইল শূন্য ভূমির ওপর হাওয়ার শব্দ কখনও হা-রে-রে-রে, কখনও হাহাকারের মতো শোনায়।' (পৃষ্ঠা ৭)

'তুই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসিস আলো! ভোরের আলো, বিকেলের আলো, চাঁদের আলো, তারা ভরা আকাশের আলো—' (পৃষ্ঠা ২৯)

'বাদার মাটি-কাদার ওপর কচি কচি শাকের বিস্তৃত আবরণে হিল্লোল তুলতে শুধু হাওয়াই পারে। বাদায় এ যেন প্রতি বছরের প্রাকৃতিক উৎসব।' (পৃষ্ঠা ৪২)

'পশ্চিমের জানলায় লজ্জাবতী লতার সারি পাতা বুজিয়ে ঘুমিয়ে আছে।' (পৃষ্ঠা ২২১)

'তখনও তাদের শবদেহের ওপর শতাব্দীর শেষ শিমুলফুল ঝরে পড়ছে।' (পৃষ্ঠা ২৭২)

কিন্তু এই বিশাল সৃষ্টির পুরোটাকে কিছুতেই কাব্যাক্রান্ত বলা যাবে না। কয়েক প্রজন্মের, বহু বছর ধরে বিস্তৃত পটভূমিতে কাহিনিপুঞ্জের বর্ণনায় সক্ষম একটা গদ্যশৈলী অনিবার্য ছিল বিষাদগাথার জন্য। সেই যথার্থ ভাষায় আমরা পেয়ে যাই বহু মানুষের জীবনের উত্থানপতনের নানা কাহিনি। এই ভাষা অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর নিজস্ব ভাষা। উপন্যাসের অনেক জায়গায় দেখি প্রলম্বিত বাক্য। চলচ্চিত্রে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে যেরকম আমরা অনেক বড় একটা এলাকা বা বহু মানুষের কর্মযজ্ঞ একসঙ্গে দেখি তেমনি এই উপন্যাসেও আমরা সেরকম দৃশ্য দেখতে পাই। এমন দৃশ্যের বর্ণনার জন্য দীর্ঘ বাক্যের কোনও বিকল্প ছিল না। পাঠক বুঝতে পারে না কখন কাহিনির ঘোরের ভেতর দীর্ঘ এক বাক্যের বিস্তারে ডুবে গেছেন। অবনীমোহন সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি ছাড়ার পর হঠাৎ করে ভুবনমোহন বাকশক্তি ফিরে পায়। তার মৃত্যুর ঠিক আগে বাদার জলে বালিসোনার নানা বয়সের মানুষের মাছ ধরার অসাধারণ দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে ১১ লাইন দীর্ঘ একটি বাক্যে। ভুবনমোহনের শ্রাদ্ধের প্রস্তুতি, তাঁর শ্রাদ্ধের খাবারের বর্ণনাও দীর্ঘ বাক্যে লেখা— 'ঘিয়ে ভাজা লুচি, ছোলার ডাল, মুগডালের খিচুরি ও পাঁচমিশালী সবজির ঘণ্ট, চাঁদোখালির দই, সুবল সাউয়ের ছানাপোড়া, আর স্থানীয় ময়রাদের আগের দিনই বাড়িতে আনিয়ে ভিয়েন বসিয়ে সারা রাত ধরে বানানো সন্দেশ রসগোল্লা লেডিকেনি দানাদার সন্ধে ছটা অব্দি দূর দূর থেকে দলে দলে লোক এসেও খেয়ে শেষ করতে পারেনি।' দীর্ঘ এসব বাক্যে আমাদের চোখের

সামনে চলচ্চিত্রের মতো দৃশ্যগুলো প্রদর্শিত হয়। সবমিলিয়ে এই উপন্যাসের গদ্যে একটা ভিন্ন স্বাদ পেয়েছি। আমার পাঠস্মৃতির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসগুলোর যে একটা ছোট তালিকা আছে, সেগুলোর মধ্যে বিষাদগাথা এক অন্যরকম উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বিষাদগাথার আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। এই উপন্যাসে মাঝে মাঝেই ভবিষ্যদ্বাণী বা ঘটনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এই ভবিষ্যদ্বাণীটা কীভাবে ফলে তা জানার জন্য একধরনের আকর্ষণ তৈরি হয় পাঠকের। দুই-একটা পূর্বাভাস এখানে উল্লেখ করছি—

'শতবর্ষ পূর্ণ হবার তেরোদিন আগে সে-ই তাঁর শেষ কথা। এরপর আবার তিনি কণ্ঠস্বর ফিরে পাবেন একশো তিন বছর বয়সে, মৃত্যুর ঠিক এগারো মাস আগে।' (পৃষ্ঠা ১৯)

মন্থরোর মার একটা ছেলে মারা যাওয়ার পর মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে সারা দিন কেঁদেছিল। সেদিনেই ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া গেল— 'সে তো তখন জানত না মাস কয়েক পরে তাকে আবার এভাবেই কাঁদতে হবে।' (পৃষ্ঠা ২৩)

এইসব ভবিষ্যদ্বাণীকে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে নিয়তির মতো, নিয়ত যার শিকার মানুষ। নিয়তিনির্ধারিত এইসব মানুষের জীবন যেন 'দারিদ্র থেকে আরও দারিদ্রের মুখে ধাবমান একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা।' এমন সকরুণ বর্ণনা পাঠকের হৃদয়কে আর্দ্র করে তোলে। পাশাপাশি সেই দারিদ্রকবলিত মানুষ যখন অদ্ভুত সততা আর আত্মমর্যাদায় কারও কারও কাছ থেকে পণ্যের বিনিময়েও টাকা নেন না, তখন আমরা অবাক হই। উপোস করে, কিন্তু কখনও মুখ ফুটে দুটো পয়সা চাইবে না। কোনও রাজ্যের রানি নন, ঐতিহাসিক কোনও চরিত্র নন, জমিদার নন, জমিদার গিন্নীও নন, হতদরিদ্র, অশিক্ষিত প্রান্তিক মানুষ মন্থরোর মা এভাবেই মহীয়সী হয়ে ওঠেন। এভাবে লেখক মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন। মন্থরোর মা শুধু একটা উদাহরণ। বালিসোনার ইতিহাসে এমন অনেক মানুষ আমরা দেখি। বালিসোনার প্রকৃতিতে যারা বেড়ে উঠেছেন। বালিসোনার জল মাটি হাওয়ায় গড়ে ওঠা সংস্কৃতিকে যারা লালন করেন। এসব মানুষকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না। মানুষের কথা বলতে গিয়ে তাই বিষাদগাথায় বার বার এসেছে প্রকৃতির কথা। বাংলার ছয়টি ঋতু যেমন বছর বছর ঘুরে ঘুরে এসে মানুষের জীবনাচরণে প্রভাব ফেলে, তেমনি এই উপন্যাসের নানা পর্বে নানা ঋতুর কথা বার বার এসেছে

'কার্তিক মাস শেষ হতে চলল, সন্ধের মুখে এখনই ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছ।' (পৃষ্ঠা ২৩)

'পরের বছর শিউলির সময় পার করে কালীপুজোর শেষে দুটো একটা করে শিউলি ঝরতে দেখা গেল। পুরো হেমন্তকাল কবরের বুকে নতুন দুর্বাঘাস শিউলিতে সাদা হয়ে উঠল। বর্ষায় কবরের ওপরের আকাশবাতাস স্বর্ণচাপার বর্ণে-গন্ধে দৈবভাব ধারণ করল।' (পৃষ্ঠা ৩৯)

'গ্রীষ্মে তিলফুলে রাস্তার দুধার দিগন্তঅবধি সাদা হয়ে উঠেছে।' (পৃষ্ঠা ২৩৪)

'গ্রীষ্মে ফলসা, বর্ষায় কদমফুল, শরতে শিউলি, হেমন্তে ছাতিম, শীতে পাটালি গুড়ের পায়েস, বসন্তে সজনেডাটার সুক্তো বাড়ি থেকে বয়ে এনে কালো ভারী একটা

টেবিলে পরীক্ষিতের উদ্দেশে পিণ্ডদানের মতো নামিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।' (পৃষ্ঠা ২৫২)

শুধু ঋতুর বর্ণনা নয়, দিনের বিভিন্ন সময়ের নিখুঁত ছবিও উঠে এসেছে। উদ্ধৃতি ভারাক্রান্ত হবে জেনেও একটা মাত্র উদাহরণ তুলে ধরছি।

'সন্ধ্যা গাঢ় হতে হতে ক্রমশ রাত নামছে। লেবু গাছগুলোর মাথায় ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি। ঠাকুরদার ঘরের মাথায় চিলেকোঠায় বাড়ির পোষা তক্ষক তালে তালে ডাকতে শুরু করেছে। তিতিরগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো, বিশেষ সাড়াশব্দ নেই।' (পৃষ্ঠা ২৫)

চিরকালের বাংলার এই প্রকৃতির চেহারা আমরা উপন্যাসের প্রথম দিকে দেখতে পাই। পাশাপাশি সময়ের তালে তালে লক্ষ করি বালিসোনার বিবর্তন। চারপাশে ঘনজঙ্গলে ভর্তি একসময়ের বালিসোনা ক্রমশ নগরায়ন ও শিল্পায়নের শিকার হয়। প্রযুক্তির হাত ধরে বালিসোনা এবং তার মানুষ এগিয়ে যেতে থাকে। পেছনে পড়ে থাকে সেই বনাঞ্চল ঘেরা বাদা। সেই ফেলে আসা দিন হয়তো কারও কারও স্মৃতির মধ্যে থাকে। সেই স্মৃতিকেই আঁকড়ে ধরে কেউ কেউ। যাদের মুখে স্মৃতি নিয়ে দার্শনিকের মতো উক্তি উচ্চারিত হয়। এরকম একটা অমোঘ উচ্চারণ পাই আমরা সপ্তম পর্বে। তার আগে এই পর্বে এক অলৌকিক ঘটনার কথা বলি। এই ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়েছে অবনীর ভাই, পরিক্ষীতের বাবা অম্বরীশের। একদিন রাতে সে দেখল জানলা টপকে একটা কঙ্কাল এসে ঘরে ঢুকছে। পিছনে আরেকটা, তার পিছনে আরও একটা। অম্বরীশ সারারাত ধরে তাদের সঙ্গে কথা বলে। সেই সময় তার ভাই অবনীর মুখ থেকে শুনি সেই বাক্যটি— 'কারও জীবন আসলে তার সারাজীবনের স্মৃতিপুঞ্জ ছাড়া আর কিছু নারে। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের নাড়ির যোগ। সব স্মৃতি হয়ে বিস্মৃতির সিন্দুকে রাখা থাকে।'

অতীতের এইসব স্মৃতি বিস্মৃতি নিয়ে বর্তমান চলতে থাকে বালিসোনায়। ঘটনা, দুর্ঘটনা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, খুন, প্রেম, বিয়ে, জন্ম মৃত্যু জীবনের সকল অনুষঙ্গ পৃথিবীর আর সব জনপদের মতো বালিসোনার বর্তমানেও আছে। লৌকিক এই পৃথিবীর ঘটনাগুলোর বেশিরভাগই তো মানুষকে ঘিরে। তাই তার প্রতিক্রিয়াও ঘটতে থাকে মানুষের অবচেতনে। সেই অবচেতনের চিত্রগুলো আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই অলৌকিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে। এটা কি একধরনের যাদুবাস্তবতা? যাই হোক, বিষাদগাথায় যে অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী আমরা হয়েছি তার বর্ণনার কৌশলে তা লৌকিক ঘটনার মতোই স্বাভাবিক এবং সত্য বলে মনে হয়। আর তাতে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের মানসিক অবস্থা পরিমাপ করে নিতে পারি। বুঝে নিতে পারি মানুষের অমোঘ পরিণতির বিষয়টি। সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করতে পারি সময় গড়িয়ে যেতে যেতে বালিসোনার মতো আমাদের পৃথিবীটা কেমন বদলে যাচ্ছে। চারপাশের জগতটা কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে ফিরে আসার পর আফসোস করে তাই অবনী বলেছিল, 'যে বালিসোনা আমি ছেড়ে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে সেই বালিসোনাকে আর খুঁজে পেলাম না। অম্বরীশের পায়ের ক্ষত দেখলেই বোঝা যায় বালিসোনায় পচন কতদূর ছড়িয়েছে।' অবনীর এই আক্ষেপের সঙ্গে পাঠকের অন্তরও

বিদীর্ণ হয়। তারা এই সত্য উপলব্ধি করে অবনীর মতো যেন বলতে চায়— 'বালিসোনায় ফিরে দেখছি হাত থেকে পড়ে যাওয়া মহার্ঘ্য গ্লাস-পেইন্টিংয়ের মতো মানুষের সব মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার, হালভাঙা মাঝির মতো তারা দিশেহারা। সেই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কী পরিণতি তার প্রত্যক্ষদর্শী হয় বালিসোনার মানুষ এবং উপন্যাসের পাঠক।' এই মুহূর্তে আমরা স্মরণ করতে পারি সেই ভয়াবহ রাতের ঘটনা— 'দেওয়ালির রাতে আকাশ জ্বালিয়ে বাজি পুড়িয়ে, বাতাস কাঁপিয়ে, পটকা ফাটিয়ে, তৃপ্তিসহকারে পানভোজন শেষ করে অনেক রাতে সবাই ঘুমে অচেতন, সেই ফাঁকে ওপরের দুটি তলা তিপান্নটি ঝুলবারান্দা সমেত হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল।' (পৃষ্ঠা ২১৯)

তখন আমার মতো পাঠকের মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়ে বালিসোনার আদিবাসী বৃদ্ধরা বলতে লাগল— 'নদী আকাশ চায়, বাতাস চায়, দুই তীর তার বৃক্ষ শিকড়বন্ধন চায়, বুকের ওপর ঘরবাড়ির এত জঞ্জালভার সে সইবে কেন!'

মানুষের আচরণে পরিবেশে ক্রমশ দুর্বিষহ চিত্রের প্রতিফলন বিষাদগাথার অনেক গল্পে দেখতে পাই। এর জন্য শুধু আক্ষেপ নয়, পর্যুদস্ত মানবতাকে শুশ্রূষা দেওয়ার দিকনির্দেশনাও আছে। উপন্যাসের ৩৭ নম্বর পর্বে আমরা দেখি লক্ষ্মীপ্রতিমার মেয়ে চিরন্তনীকে 'মঙ্গলমঞ্চ' আন্দোলনের পক্ষ হয়ে বক্তৃতা দিতে। সেই বক্তব্য মানুষের জন্য আরও বহুদিন প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে। মঙ্গলমঞ্চ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে বলতে গিয়ে চিরন্তনী বলেছিল— 'বর্ষার জল পেয়ে আগাছার মতো, লোভের জল পেয়ে দুর্নীতি, দুঃশাসন, স্বার্থসর্বস্বতা সমাজের সব স্তরে হু হু করে বেড়ে চলেছে।' এই একই বক্তৃতায় পুরো মানবসমাজের জন্য একটি দিকনির্দেশনাও পাই— 'শুধু প্রতিবাদ না, বিকল্প মূল্যবোধও প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' সেই একই অনুষ্ঠানে পরিক্ষীতের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয় চিরকালের বাণীর মতো কথা— 'মানুষকে সারাজীবন লড়াই করে যেতে হবে তার চারপাশের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। প্রত্যেকের জীবনে জয়ী হবার একটাই পথ।'

মানুষের নিয়তি, তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছুর বিপুল সম্মিলন ঘটেছে বিষাদগাথায়। সত্যের মতো সাংঘাতিক দুঃসহ বিস্ময়ে ভরা ঘটনার এক মহামিছিল এই উপন্যাস। একটার সঙ্গে একটা এক দীর্ঘ সূতোয় বাঁধা। এমন অসংখ্য ঘটনার একটি উল্লেখ না করে পারছি না।

লজ্জাবতী-ময়নামতী নামে এক যমজ বোনের জন্মান্ধ ভাই দূর সমুদ্রে মালবাহী জাহাজের নাবিক জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটিয়ে জটিল চিকিৎসায় দৃষ্টিলাভ করে নিজের বালিসোনা গ্রামে ফিরে তার দিদিদের দেখার জন্য ব্যাকুল। ভাই ফিরেছে শুনে দিদিরাও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এখনই একবার অন্তত ভাইকে চোখের দেখা দেখতে চায়।

''লজ্জাবতী-ময়নামতী ভাইকে এরকম পরিবেশে আসতে দেবে কিনা তা নিয়ে পরীক্ষিতের মনে সংশয় ছিল। বলল, 'ভাইয়ের সঙ্গে কোথায় দেখা করতে চাও?'

'আমাদের তো কোথাও যাবার উপায় নেই, ওকেই এখানে নিয়ে আসুন। একবার অন্তত চোখের দেখা দেখে নিই।'

শুনে শুভরও আর তর সয় না। বেলা থাকতে থাকতে পরীক্ষিতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

মুখে পুরু পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক, ঝলমলে শাড়ি-ব্লাউজে সেজে তার দিদিরা দরজার বাইরে কেন দাঁড়িয়ে আছে ভেবে না পেয়ে শুভ দুজনের হাতে গার্নেটের লাল টুকটুকে বালা তুলে দিতে দিতে বলল, 'আমি আসব বলে তোমরা এমন সেজেছ?'

'তুই দেখতে পাস? তুই আমাদের দেখতে পাচ্ছিস? মা গো!'

প্রথম বাক্যটা লজ্জাবতীর। দ্বিতীয়টা ময়নামতীর। 'মাগো!' দুজনের একসঙ্গে কঁকিয়ে ওঠা।

'এটা খুব বিচ্ছিরি জায়গা! ফিশিং হারবারের মতো আঁশটে গন্ধ!' শুভর মুখ থেকে সব খুশি নিমেষে মুছে গেল।

দুই বোন গলা চিরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওকে এখানে আনলেন কেন?'

'তোমরাই তো বললে।'

'ও যে দেখতে পায় বলেন নি তো?'

'এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে বলে তোমরা খুশি হওনি?'

এক মাঝবয়সি মাতাল 'লজ্জাবতীর লজ্জা ভাঙতে এয়েচি গো!' বলতে বলতে ময়নামতীর চিবুক ধরে আদর করতেই ময়নামতী পিছন ফিরে মুখ আড়াল করল।

'দিদি গো! কী মুখ দেখলাম তোমাদের! জীবনে প্রথম তোমাদের দেখলাম। এই তোমাদের বাড়ি? এখানেই তোমরা থাকো?' বলতে বলতে শুভ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।"

কবেকার ঘটনা-পরম্পরায় নিজেদের ভিটেমাটি হারিয়ে তার দিদিদের এখানে এই পতিতালয়ে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে। সেও এক মর্মান্তিক আখ্যান। উপন্যাসের কাহিনি সত্যি নয়, কিন্তু সেখানে বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে। নিদ্দা কোনও ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। (যে নিদ্দা হা-মুখ সংসার টানতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বুড়োবয়সে কংকাল খোঁড়ার ব্যবসা ধরে।) কিন্তু নিদ্দার মাধ্যমে আমরা মানুষের ইতিহাসকে খুঁজে পাই। বালিসোনার প্রতিটি ঘটনার মাধ্যমে আমরা মানুষের আচরণ, সংস্কৃতি, সংস্কারকে অবলোকন করি। দেখি নানা ঘটনা প্রবাহের ভেতর দিয়ে কীভাবে মানুষেরই মুখে প্রবাদের জন্ম হয়। একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজনৈতিক নেতা রুদ্র ঝম্পটি শ্বাসনালীতে অদ্ভুত ভাবে মাংসের হাড় আটকে বহুদিন দুরারোগ্য হাঁফানির রোগী। তার শবদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় একটি কংকালসহ নিদ্দাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। সেই ভ্যান রিক্সায় একটি মৃতদেহও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দুটি লাশ মুখোমুখি হল তখন। পরের দিন আদালতে নির্দয় অমানবিক জেরার অত্যাচারে নিদ্দাও মরে যায়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বালিসোনার কেউ একজন ছড়া বানাল—

মুখোমুখি যদি হয় দুই শবদেহ
দুইয়ে মিলে সাথী চায় আরও এক দেহ।

পরে সেই ছড়াটিই প্রবাদে পরিণত হয়— মুখোমুখি শবদেহ, সাথী হবে আর কেহ।

উপন্যাস শেষ হবার মুখেও বৃদ্ধ, অন্ধ, অপ্রকৃতিস্থ পিতামহের সঙ্গে পৌত্রের

সামান্য কথোপকথনও আমাদের এই বসুন্ধরার এক অসামান্য সংকটের আভাস দিয়ে যাচ্ছে। অংশটির উল্লেখ না করে পারলাম না!

পরীক্ষিতের মৃত্যু প্রদীপের মনে থাকে না। অনেকদিন পরে পরে হঠাৎ কখনও কখনও কোমর ভেঙে লাঠি ঠুকে ঠুকে পরীক্ষিতের দরজা পর্যন্ত এসে বলে যায়, 'কাল যাবি তো রে, পরীক্ষিৎ? বীজে পোকা ধরে যাচ্ছে।'

অরণ্য গলা পালটে বলে, 'কাল পারব না প্রদীপদা। পরশু নিশ্চয়ই যাব।'

'মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এখন কাল-পরশু করলে কি চলে! প্রকৃতিকে যারা ভালোবাসে না তারাই শুনেছি এগিয়ে আছে।'

'বীজ' বলতে বালিসোনার নদীর ধারের জমিতে লাগানোর মতো ভালো বৃক্ষের বীজ আর ভালো মানুষের বীজ! একটা কোনো পাত্রে নাকি এইসব বীজ রাখা আছে। শুকনো মরা লতাপাতা ও গাছের ডালপালা ভরা প্রদীপের ঘরে।

শুরুতে বলেছিলাম বালিসোনা যেন আমাদের পুরনো এই পৃথিবীর একটি প্রতীক। আর তার ভেতর দিয়ে আমরা এই পৃথিবী আর তার মানুষগুলোকে দেখি। বিষাদগাথা মূলত মানুষের মহাকাব্য।

লেখক পরিচিতি

কবি ও সাংবাদিক। বার্তা সম্পাদক, প্রথম আলো, চট্টগ্রাম অফিস। প্রকাশিত কবিতার বইয়ের সংখ্যা ৮। শিশুসাহিত্য ও অন্যান্য বইয়ের সংখ্যা ৬। উপন্যাস ১টি।